জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা ঃ ষোল

প্রসবোত্তর পরিচর্যা

ডাঃ ধীমান মৈত্র

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

শুভেচ্ছা

স্বাধীনতার পরবর্তী চার দশকে ভারত যে উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণার একটি বড় ভিত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, এটা এক সর্বস্বীকৃত সত্য। এর পাশাপাশি এটাও এক লজ্জাজনক সত্য যে এখনও এদেশের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর অক্ষরজ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই, দারিদ্র্য-অশিক্ষা-কুসংস্কারের গাঢ় অন্ধকারে তারা জীবন কাটায়। খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার ন্যূনতম সংস্থান দেশের অধিকাংশের নেই।

সমাধান অবশ্যই নিহিত আছে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্যে। তবে আশু করনীয়ও আমাদের কিছু আছে। আমাদের চারপাশে যে যোজন-বিস্তৃত অন্ধকার, সেখানে ক্ষীণ আলোটুকু পৌঁছান, কুসংস্কার দূর করতে বিজ্ঞানচেতনার প্রসার, প্রতিকূলতার মধ্যেও মোটামুটি সুস্থ থাকার পথ-নির্দেশ—এ ধরনের কিছু প্রচেষ্টা শুরু হতেই পারে এবং হওয়া জরুরীও। সরকারী চেষ্টা সরকারী তরফে হোক, পাশাপাশি এবং পরিপূরকভাবে গড়ে উঠুক আরো হাজারটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' সংস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা তার নামেই প্রকাশ। গত কয়েক বছর ধরে এই সংস্থা পত্র-পুস্তিকা, বক্তৃতা-আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামে কাজ করছে। এদের বর্তমান পুস্তিকা 'প্রসবোত্তর পরিচর্যা' জনজীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে সকলকে অবহিত করবে যে বিষয়ে সচেতনতার একান্ত অভাব। নারী সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত সম্প্রদায়, অথচ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নির্ভর করে নারীশক্তির ওপর। সন্তানজন্মের পর প্রয়োজনীয় পরিচর্যার অভাবে অগণ্য জননী জীবনভর অস্বাস্থ্যের শিকার হয়ে পড়েন, শত সহস্র নারীর জীবনে নামে অকাল যবনিকা। অতএব ব্যাপক জনচেতনার জন্য এমন একটি বইয়ের প্রয়োজন অপরিসীম। এই পুস্তিকার সাফল্যের জন্য আমার ঐকান্তিক শুভেচ্ছা রইলো।

26 জুলাই, 1988

ভারতী রায়
সহ-উপাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের কথা

ব্যাপক জনগণকে এক সুস্থ জীবনবোধে উদ্দীপিত করা, তাদের মধ্যে সঠিক স্বাস্থ্য চেতনার প্রচার প্রসারের অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের সংস্থার জন্ম। আমাদের কর্মপন্থার যথার্থতা সম্পর্কে আমরা জনগণের কাছে দায়ভাগী। আমাদের প্রকাশনা প্রকল্প এখন স্বনির্ভর, সরকারী বেসরকারী কোন সংস্থার আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই এই প্রচেষ্টা তার ভিত্তিভূমি পেয়েছে অগণিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর সমর্থনে। স্বল্পমূল্যে এই প্রয়োজনীয় পুস্তিকাগুলি প্রকাশের জন্য অনেক অভিনন্দন আমরা পেয়েছি, আবার স্বল্পতর কণ্ঠের হলেও কিছু বিরূপ সমালোচনাও আমাদের জুটেছে। এই বিরূপ মন্তব্য এসেছে শহরাঞ্চলের কিছু মধ্যবিত্তজনের কাছ থেকে—পুস্তিকাগুলির কলেবরের তুলনায় দাম বেশী। তাঁরা এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বাজার-চলতি পত্রপত্রিকার তুলনা এনেছেন।

আমাদের পুস্তিকাগুলির গুণগত উৎকর্ষ, পরিবেশনার পারিপাট্য ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনার ভার আপনাদের। আমাদের বক্তব্য শুধুমাত্র এই যে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে এই প্রচেষ্টার বিচারের নিরিখটা এক হতে পারে না। কোন জনপ্রিয় পত্রিকা আপনি কেনেন, পড়েন ও ভুলে যান। আমাদের একটি পুস্তিকা আপনি যখন কেনেন, আপনি এই সংস্থা সম্পর্কে কৌতূহলী হন, আমাদের অন্যান্য কর্মপন্থা জানতে চান, তাতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অর্থাৎ আপনি একটি আন্দোলনের অংশীদার হয়ে যান। আপনি তাই আমাদের কাছে মাত্র গ্রাহক নন, আপনি আমাদের দূরের বন্ধু, আমাদের প্রচেষ্টার শরীক। অতঃপর এই বিবেচনা গৌণ হয়ে যায় যে আপনার কাছ থেকে দু-চার পয়সা বেশীকম নেওয়া হলো। তা সত্ত্বেও সকলের জ্ঞাতার্থে জানাই, সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রকাশনা থেকে যে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, তা আমাদের অন্য প্রকল্পে নিয়োজিত হয়। আমাদের অন্য কোন আয়ের সূত্র নেই।

30 জুলাই, 1988

সুখময় ভট্টাচার্য
কর্মসচিব।

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, 1988

প্রসবোত্তর পরিচর্যা

বছর সাতেক আগের কথা। ফাইনাল এম. বি. বি. এস. প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা দিচ্ছি। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষা সেদিন। দু'দিন আগে বাচ্চা হয়েছে এমন এক মহিলাকে খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছি, বিরাট বপু পরীক্ষক পাশে এসে দাঁড়ালেন। এটা ওটা জিজ্ঞেস করার পর প্রশ্ন করলেন, 'ওকে ছুটি দেবার সময় কী কী উপদেশ দেবে?' একেবারেই কমন কোশ্চেন, গড় গড় করে মুখস্থ বলতে থাকলাম, 'প্রথমেই স্যার, পর্যাপ্ত বিশ্রাম। দিনের বেলা খাওয়ার পর অন্তত দু'ঘণ্টা আর রাতে আট ঘণ্টা ঘুম ছাড়াও হাল্কা কাজ, ভারী জিনিষ না তোলা '…মাঝপথেই থামতে হলো, ভুরু কুঁচকে মাস্টারমশাই একগোছা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'জানো কি ওর বাচ্চা কটা? তাদের কে দেখবে? ওর বাড়ীতে আর কে কে আছে? তাদের রান্না করে খাওয়ানোর দায় কার? বাসন-মাজা, কাপড় কাচা, জল তোলা, ঘর মোছা— এ সবের জন্যে কটা দাসী-বাঁদী ওর আছে? এসব সেরে দিনে ও চার ঘণ্টা ঘুমোতে পারে?'

নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম, এগুলো জানা হয়নি।

পরের প্রশ্ন—'খাবার জন্যে কী কী বলবে?' একটু দমে গেলেও উত্তরটা জানা। তাই ঝটপট শুরু করলাম, 'স্যার, এই সময়ে বাচ্চা বুকের দুধ খায় বলে মায়েদের বাড়তি 700 ক্যালরি শক্তি প্রয়োজন, অর্থাৎ দিনে 2900 ক্যালরি। সুতরাং ওর দৈনন্দিন খাবারে থাকবে…'এর পরের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাটের বড় বড় হিসেবগুলো শোনানোর সুযোগ পেলাম না। একেবারেই অবান্তর এক প্রশ্ন করলেন মাস্টারমশাই।

'বাবা কী করেন?'

'আজ্ঞে স্যার, সরকারী কেরানী।'

'নিজের খাবারে দিনে কত ক্যালরি জোটে? 2900 ক্যালরি তুমি নিজে কতদিন খাও?'

আমি নিরুত্তর। আবার প্রশ্ন—'মেয়েটির স্বামী কী করে জানো? জানো মাসে ওর পরিবারে মোট কত রোজগার আর কজন সেই পয়সায় খায়?'

এতক্ষণে বুঝে গেছি, এ যাত্রা পাশ করা হলো না। একেবারেই সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন। কোন বইতেই এসবের উল্লেখমাত্র পাইনি তো উত্তর কী দেবো! কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। নিতান্তই করুণ অবস্থা দেখে বোধহয় তাঁর দয়া হলো, প্রশ্নবাণ বন্ধ হলো।

পিঠে বেশ সহানুভূতির হাত রেখে বললেন—'বাপু হে, বই মুখস্থ করলে পরীক্ষা পাশ করতে পারো বটে, তবে ডাক্তারী করা হবে না। মানুষের সমস্ত রোগের মূল কারণ দেখবে অনেকটাই তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। তাই তার চিকিৎসার সময় নিজের পকেট তো নিশ্চয় ভরাবে, তবে সাথে সাথে তার সঙ্গতির কথাও মাথায় রেখো। নচেৎ সবই বৃথা। মাছ-মাংস-দুধ-ডিম-ফলের বিধান লোক বুঝে অবশ্যই দেবে, কিন্তু গরীব-গুর্বোর জন্যে চুনো মাছ, গেঁড়ি-গুগলি, শাক-সব্জি, অথবা বড়া গোস্তের ফরমানও কিছু শিখে রেখো। কাজে আসবে।'

মুখ বুজে সব সহ্য করলাম। পরীক্ষায় পাশ! তবে কথা কটি সত্যি বলতে মাথায় ছিলো না। আসলে পাশ করার পর দুবছর ধরে মেডিকেল কলেজে স্টেথো ঝুলিয়ে সদ্য ডাক্তার হওয়ার তুরীয় আনন্দে মনে হতো, মাসে লাখ দুলাখ রোজগার করে লোক-দেখানো গরীব প্রীতি আমরাও সময় সুযোগ পেলে অনেক দেখাতে পারি!

এর কিছুদিন পর চাকরী পেয়ে যখন প্রথম সত্যিকারের দেশের সাধারণ মানুষ মানে না-খেতে-পাওয়া, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, গেঁয়ো লোকজনের কাছাকাছি এলাম, তখন ক্রমশ বুঝতে পারলাম, শুধুমাত্র কেতাবী বিদ্যে কত অকিঞ্চিৎকর। তাই এখন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে চতুর্থ সন্তানের জন্মদাত্রী হাসিনা বেগমের ছুটির কাগজে নিয়মমাফিক প্রচুর বিশ্রাম, ভালো ভালো পুষ্টি-কর খাবার, দামী টনিক, ভিটামিন ক্যাপসুল, এবং এক কেজি আটশো গ্রাম ওজনের বাচ্চাটার জন্য দু-তিন ঘণ্টা অন্তর বুকের দুধ, প্রয়োজনে ল্যাক্টোজেন, ইনফ্যাণ্ট ফর্মুলা, ভিটামিন ফোঁটা ইত্যাদি লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। হাসিনার অপুষ্ট বুক, ছত্রিশ কেজি ওজনের ভঙ্গুর শরীর, চারটে বাচ্চা-স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-ভাজ-ভাসুর-দেওর ইত্যাদি মিলিয়ে চোদ্দ জনের সংসারের ছবিটা মনে এসে আমার কলমের গতি রোধ করে দেয়।

প্রসবোত্তর কাল :

সন্তান ধারণের মুহূর্ত থেকে প্রসব পর্যন্ত মহিলাদের শরীরে, বিশেষ করে প্রজনন সম্পর্কিত বিভিন্ন অঙ্গে, নানারকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রসবের পর ক্রমশ এই সমস্ত অঙ্গ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় মোটামুটি ছয় থেকে বারো সপ্তাহে। এই বিশেষ সময়টিকে প্রসবোত্তর কাল বলা হয়। তবে স্তনগ্রন্থিতে এই ভাঁটার টান আসে অনেক পরে। কারণ বাচ্চার দুধ

যোগাতে এই সময় মায়েদের স্তনগ্রন্থি অধিকতর সজীব হয়ে ওঠে।

প্রসবোত্তর কালে শরীরে মোটামুটি যে যে পরিবর্তন দেখা যায়—

ক) সাধারণত প্রসবের পরে নাড়ীর গতি সামান্য বাড়ে। দ্বিতীয় দিন থেকে তা কমতে থাকে এবং তৃতীয় দিন থেকে স্বাভাবিক হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যধিক বিশ্রাম, কম খাওয়া বা শরীর থেকে বেশী জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে নাড়ীর গতি খুব কমে যেতে পারে। **তবে নাড়ীর গতি মিনিটে একশোর বেশী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন**

খ) প্রসবের পরে শরীরের তাপমাত্রা সামান্য কমলেও প্রথম দিনে তা একটু বেশী থাকে। তবে 99° ফা (37·2° সে)-এর বেশী নয়। তৃতীয় দিনের থেকে বুকে দুধ জমার জন্যে সামান্য জ্বর আসতে পারে, যা দু-এক দিনের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যায়। **তবে জ্বর বেশী হলে প্রথমেই প্রস্রাবে জীবাণু সংক্রমণের কথা ভাবা উচিত।**

গ) গর্ভাবস্থায় শরীরে বেশী পরিমাণে জল জমা থাকে। বাচ্চা হওয়ার পর থেকে এই জল দ্রুত শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সেইজন্য প্রসবের দুই বা তিন দিন থেকে প্রচুর প্রস্রাব হয়। তবে বাচ্চা হওয়ার পর পরই কখনো কখনো বিশেষ করে প্রসবদ্বারে ব্যথা বা মূত্রথলিতে দীর্ঘক্ষণ চাপ থাকার জন্যে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ব্যথার জন্য প্রথম কয়েকদিন পায়খানা নাও হতে পারে।

ঘ) গর্ভাবস্থায় সাধারণত আট-দশ কেজি ওজন বাড়ে। বাচ্চা জন্মানোর পর এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। বাচ্চা, বাচ্চা যে জলভর্তি থলিতে থাকে সেই জল, গর্ভফুল ইত্যাদির ওজন প্রায় চার কেজি। এছাড়াও শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়, ফলে আরো প্রায় দু কেজি ওজন কমে।

ঙ) জরায়ু ক্রমশ ছোট হতে থাকে। বাচ্চা হওয়ার সময় সাধারণত জরায়ুর ওজন থাকে নশো গ্রাম। ধীরে ধীরে তা কমে প্রায় ষাট গ্রামে এসে দাঁড়ায়। জরায়ুর এই সংকোচন অত্যন্ত নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হারে হয়। এর ব্যত্যয় দেখলে বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা মাথায় রাখা দরকার। সাধারণত বাচ্চা হওয়ার পর জরায়ু নাভির সামান্য নীচে থাকে। প্রথম দিনে এর কোন হেরফের হয় না। তারপর প্রতিদিন এর উচ্চতা প্রায় আধ ইঞ্চি করে কমতে কমতে দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে আর পেটের ওপর থেকে পরীক্ষায় বোঝা যায় না। পুরোপুরি শ্রোণীদেশে ঢুকে যায়। **জরায়ু তার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় নেয়।**

চ) এই সময়ে সাধারণত তিন-চার সপ্তাহ ধরে জরায়ু থেকে এক ধরনের স্রাব হয়। এর রঙ গন্ধ পরিমাণ ইত্যাদি থেকে চিকিৎসকেরা বিভিন্ন অস্বাভাবিকতার হদিশ করতে পারেন। প্রথম তিন-চার দিন রক্ত মিশ্রিত থাকে বলে এর রঙ হয় লালচে, ক্রমশ তা ফিকে হয়ে হালকা হলুদ বা বাদামী রঙ নেয়। শেষের দিকে স্রাব হয় ঘোলাটে সাদা। **তিন সপ্তাহ পর থেকে ক্রমে এই স্রাব বন্ধ হয়ে যায়।**

ছ) বাচ্চা হওয়ার পর আবার মাসিক শুরু হওয়ার সময় বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। তবে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ওপর তা অনেকটা নির্ভর করে। যদি মা বাচ্চাকে বুকের দুধ না খাওয়ায়, তবে শতকরা চল্লিশভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে মাসিক শুরু হয়। বারো সপ্তাহের শেষে মাসিক শুরু হয় শতকরা আশি জনের। অন্যদিকে বাচ্চা যদি মায়ের দুধ খায়, তবে যতদিন বুকে দুধ থাকবে ততদিন শতকরা সত্তর জন মহিলার মাসিক বন্ধ থাকে। বাকী শতকরা তিরিশ জনের ক্ষেত্রে বুকের দুধ খাওয়ানো সত্ত্বেও মাসিক শুরু হতে পারে। সুতরাং **বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোটা এক ধরনের স্বাভাবিক গর্ভনিরোধক প্রক্রিয়া।**

জ) যে সমস্ত মায়েরা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায় না, তাদের ডিম্বকোষে ডিম্বাণু উৎপাদন শুরু হয় বাচ্চা হওয়ার প্রায় দশ সপ্তাহ বাদে। অন্যদিকে বাচ্চা বুকের দুধ খেলে এই প্রক্রিয়া প্রায় সতেরো সপ্তাহ বাদে শুরু হয়। বাচ্চা হওয়ার পর মাসিক বন্ধ থাকাকালীন অবস্থাতেই নতুন করে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে শতকরা প্রায় তিন থেকে দশ জনের।

ঝ) গর্ভাবস্থায় মেয়েদের বুক ক্রমশ বড় আর ভারী হয়। এই সময় গাঢ় হলুদ রঙের যে জলীয় রসক্ষরণ হয়, তাকে কলস্ট্রাম বলে। কলস্ট্রাম বাচ্চা হওয়ার পর প্রথম দু-তিন দিন পরিমাণে অনেক বেড়ে যায়। তৃতীয় বা চতুর্থ দিন থেকে বুকে দুধ আসে। শুরুতে বুকে টান ধরে, ব্যথা হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে বাচ্চা দুধ টানা শুরু করলে এইসব কষ্ট চলে যায়। বাচ্চা যতদিন মায়ের বুক চোষে ততদিন ধরেই বুকে দুধ থাকে। **তাই বুকের দুধ ঠিকমত এবং প্রয়োজনমত পেতে হলে বাচ্চাকে নিয়মিতভাবে বুকে ধরতে হয়।**

কলস্ট্রামে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন-এ, সোডিয়াম ও ক্লোরাইড ছাড়াও Ig-A নামে এক ধরনের বিশেষ পদার্থ থাকে, যা বাচ্চার স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সেজন্য বাচ্চা জন্মানোর চার থেকে ছয় ঘণ্টা পর থেকেই

বাচ্চাকে বুকে ধরানো শুরু করা উচিত, প্রতিবারে অন্তত তিন মিনিটের জন্য।

বাচ্চা হওয়ার পরে প্রথম সপ্তাহে দিনে কতটা দুধ তৈরি হয়, তার ধারণা পাওয়া যায় এই নিয়মে—বাচ্চা হওয়ার পর কতদিন হয়েছে × ষাট মিলিলিটার। অর্থাৎ এই নিয়মে বাচ্চা হওয়ার পাঁচদিন বাদে সারাদিনে মোট দুধ তৈরি হয় পাঁচ × ষাট= তিনশো মিলিলিটার। আর দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ থেকে মোটামুটি প্রতিবারে বাচ্চা মায়ের বুক থেকে একশো কুড়ি থেকে একশো আশি মিলিলিটার দুধ টানতে পারে।

প্রসব-পরবর্তী পরিচর্যা—কেন ও কিভাবে ?

মূলত চারটি উদ্দেশ্যে সদ্য-প্রসবাদের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। এক, মায়ের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা। দুই, জীবাণু সংক্রমণের প্রতিরোধ। তিন, বুকের যত্ন নেওয়া, যাতে বুকে যথেষ্ট দুধ জমে এবং বাচ্চাকে নিয়মিত দুধ দেওয়া যায়। চার, গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা অর্থাৎ যাতে আবার তাড়াতাড়ি বাচ্চা না জন্মায়, সে ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

ক) বাচ্চা জন্মানোর পর মা অন্তত ছয় ঘণ্টা বিশ্রামে থাকবে। এই সময়ে অত্যধিক রক্তস্রাব বা অন্য কোন কষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। মায়ের পছন্দমত যে কোন হাল্কা পানীয় অথবা খিদে থাকলে সামান্য কিছু খাবার দেওয়া যেতে পারে। যদি খুব বেশী ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত মনে হয়, তবে কখনও কখনও মায়েদের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়।

খ) ছয়-আট ঘণ্টা বিশ্রামের পর বাথরুমে যাওয়া বাচ্চাকে বুকে নেওয়া ইত্যাদি কাজ শুরু করা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটাচলা শুরু করার কতগুলো সুফল পাওয়া যায়। যেমন—(এক) অসুস্থ ভাব চলে গিয়ে সদ্য মা হওয়ার সুখ অনুভূত হয়। (দুই) পায়খানা বা প্রস্রাব করতে কম অসুবিধা হয়। (তিন) জরায়ুতে রক্ত ও অন্যান্য স্রাব জমা না থেকে সহজে বেরোতে পারে। ফলে জরায়ু দ্রুত ছোট হয়ে স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসে। (চার) শিরাতে রক্ত জমাট বেঁধে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা কমে।

তবে কোন অবস্থাতেই অন্তত ছয় সপ্তাহের আগে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা উচিত নয়। এই সময়ে যতটা সম্ভব বিশ্রাম নিতে হবে। দিনের বেলা খাওয়ার পর অবশ্যই দু-ঘণ্টা ঘুমোনো দরকার। এছাড়া কোন ভারী জিনিষ তোলা বা ঠেলা অথবা বেশী পরিশ্রমের কাজ করা অনুচিত।

গ) বাচ্চা জন্মানোর দিন সাধারণত হাল্কা খাবার দিলেও পরদিন থেকেই মায়েদের স্বাভাবিক খাবার দেওয়া যায়। বাচ্চা বুকের দুধ খেলে বেশী পরিমাণে প্রোটিন-ফ্যাট-ভিটামিন-খনিজ পদার্থ এবং প্রচুর তরল পানীয় খেতে হয়।

50 কেজি ওজনের মহিলাদের জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিকাল কাউন্সিল অনুমোদিত খাবারের তালিকা (1968)

	গর্ভাবস্থায়	বাচ্চা বুকের দুধ খেলে
ক্যালরি	2500	2900
প্রোটিন (গ্রাম)	60	70
ফ্যাট (গ্রাম)	50	50
কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	460	550
ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	1	1
আয়রণ (মিলিগ্রাম)	40	30
ভিটামিন এ (আন্তর্জাতিক একক)	3000-4000	3000-4000
ভিটামিন-ডি (")	200	200
ভিটামিন বি-1 (মিলিগ্রাম)	1-2	1-2
ভিটামিন সি (")	50	50
ফলিক অ্যাসিড (মাইক্রোগ্রাম)	150-300	150-300
ভিটামিন বি-12 (")	1·5	1·5

এই অঙ্কের হিসেবকে দৈনিক খাদ্যের রূপ দিলে মোটামুটি এমন দাঁড়ায় যে 50 কেজি ওজনের মহিলাটি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খাবেন— 1) সকালের টিফিন— একখানা রুটি (চিনি বা গুড় দিয়ে), একটি কলা বা 50 গ্রাম ছোলা, এক গ্লাস দুধ বা একটি ডিম, দুখানা বিস্কুট ও এক কাপ চা। (2) দুপুরের খাবার—150 গ্রাম চালের ভাত, 50 গ্রাম ডাল, 50 গ্রাম মাছ (যে কোন জাতের) বা একটি ডিম, 100 গ্রাম আলু, 100 গ্রাম শাক-সবজি ও দু-এক টুকরো লেবু। (3) বিকেলের টিফিন - 1টি রুটি বা 50 গ্রাম মুড়ি, এক গ্লাস দুধ বা 50 গ্রাম বাদাম, একটি কলা বা পেয়ারা বা আম, দুখানা বিস্কুট ও এককাপ চা। (4) রাতের খাবার—2 খানা রুটি, 50 গ্রাম ডাল, 50 গ্রাম মাছ বা একটি ডিম, 50 গ্রাম আলু, 50 গ্রাম শাকসবজি। স্তন্যদানের সময় মহিলাটিকে

এই খাদ্যের সঙ্গে খান দুয়েক রুটি, মাঝারি একবাটি ভাত ও একবাটি ডাল বাড়তি খেতে হবে।

ঘ) বাচ্চা হওয়ার পর পেটের এবং মূত্রথলির মাংসপেশী সামান্য শিথিল থাকে। ফলে অনেক সময় মূত্রথলিতে জমা থাকলেও প্রস্রাবে অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য বাচ্চা হওয়ার ছয়-আট ঘণ্টা পর এবং তারপর প্রতি চার থেকে ছয় ঘণ্টায় মেয়েদের নিজের চেষ্টায় প্রস্রাব করা উচিত। অন্যথায় মূত্রনালীতে সহজেই জীবাণু সংক্রমণ ঘটে। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তবে চিকিৎসকের সাহায্যে ক্যাথিটার বা নল দিয়ে প্রস্রাব করানো দরকার। নিজেরা নল ব্যবহার করা কখনোই ঠিক নয়। জীবাণু সংক্রমণ ছাড়াও মূত্রনালীতে আঘাত লাগতে পারে।

ঙ) বাচ্চা হওয়ার পর কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা। পেট এবং কোমরের মাংসপেশীর শিথিলতা, জননদ্বার ও তার চারপাশের ব্যথা ইত্যাদি কারণে পায়খানা করতে অসুবিধা থাকে। তবে স্বাভাবিক খাবার ও প্রচুর জল খেলে এবং তাড়াতাড়ি হাঁটাচলা শুরু করলে এই অসুবিধা দূর হয়। নিতান্ত প্রয়োজনে হাল্কা জোলাপ জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

চ) এ সময়ে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম অত্যন্ত জরুরী। অত্যধিক কায়িক শ্রম অথবা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে যথেষ্ট ঘুম দরকার। তাছাড়া পেট ব্যথা, জননদ্বারে ব্যথা, বুকে দুধ জমে যাওয়ার জন্যে কষ্ট ইত্যাদি থেকেও মুক্ত থাকা দরকার। সেইজন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ব্যথার ও ঘুমের ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

ছ) বাচ্চা হওয়ার পরপরই জননদ্বার/মলদ্বার এবং তার চারপাশ পরিষ্কার সাবান জল/ডেটল জলে ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় বা স্যানিটারী প্যাড দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। প্রতিবার পায়খানা/প্রস্রাবের পর একইভাবে যত্ন নিতে হবে। যতটা সম্ভব শুকনো রাখা এবং নিয়মিত সময়ে কাপড় বা প্যাড পালটানো দরকার। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে জননদ্বারে সেলাই দেওয়া থাকে। সেক্ষেত্রে বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। দিনে অন্তত দুবার গরম জলে ডেটল দিয়ে ধোয়া এবং জীবাণুনাশক মলম বা পাউডার দিতে হয়। অপরিষ্কার পোষাক বা বিছানা থেকে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে ক্ষত পেকে যেতে পারে।

জননদ্বারে সেলাই থাকলে সাধারণত পাঁচ-সাত দিনে তা নিজে থেকেই ক্ষয়ে যায়। যতদিন পর্যন্ত ক্ষত না শুকোয় বা জরায়ু থেকে স্রাব বন্ধ না হয়, ততদিন কখনোই পুকুরে নেমে চান করা উচিত নয়। সর্দি-কাশি বা

অন্য কোন সংক্রামক রোগে ভুগছে এমন কারো সাহচর্যে না থাকাই ভালো, নচেৎ মাও বাচ্চা দুজনেরই ক্ষতি হতে পারে।

জ) স্তনের যত্ন বিশেষভাবে নেওয়া উচিত। কারণ বাচ্চার জন্যে মায়ের দুধই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আহার। তাছাড়া বাচ্চা দুধ ঠিকমত না টানতে পারলে দুধ জমে বুকে ব্যথা বা মারাত্মক ফোঁড়া হতে পারে। প্রতিবার বাচ্চাকে স্তনে দেওয়ার আগে পরিষ্কার জলে স্তনের বোঁটা ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হয়। বাচ্চার খাওয়া হলে শুকনো কাপড়ে মুছে পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে স্তনের বোঁটা ঢেকে রাখা দরকার। নরম ব্রেসিয়ার ব্যবহার করলে স্তন নীচের দিকে ঝুলে ভারী ঠেকবে না। এতে স্তনের টনটন করা ব্যথা কমে আরাম বোধ হবে। যদি স্তনের বোঁটায় দুধ বা ময়লা জমে দুধ আসার নালীগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে যায়, তবে পরিষ্কার তেলে কাপড় ভিজিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বোঁটায় লাগিয়ে রাখতে হবে। পরে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে নিতে হবে।

ঝ) মা যদি সুস্থ থাকে, তবে বাচ্চাকে মায়ের কাছেই রাখতে হবে। এতে মা ও বাচ্চা দুজনেরই মানসিক ও শারীরিক ঘনিষ্ঠতা সহজে তৈরি হয়, বিশেষ করে অজানা অচেনা এই কঠিন দুনিয়ায় সম্পূর্ণ অসহায় জীবটি তার সবথেকে নিরাপদ আশ্রয়টি সঠিক চিনে নিতে পারে। ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ সুস্থতর হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অন্যদিকে মাও (বিশেষ করে প্রথম সন্তান প্রসবকালে) ক্রমশ বাচ্চার যত্ন নিতে অভ্যস্ত হতে থাকে। বাচ্চার খিদে পেলেই তাকে বুকে ধরতে হয়, এতে তাকে খাওয়ানো সহজ হয়। বাচ্চাকে সব সময় বসা অবস্থায় বুকের দুধ খাওয়াতে হয়।

ঞ) প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে শোয়া অভ্যাস করতে হয়। এতে জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থানে সহজে ফেরে।

ট) বাচ্চা হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ স্বামী সহবাস বন্ধ রাখা ভালো।

ঠ) মায়ের রক্ত নেগেটিভ (Rh-Negative) এবং বাচ্চার রক্ত পজিটিভ (Rh-Positive) হলে মাকে বাচ্চা হওয়ার তিন দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় (Anti-D Gamma Globulin) ইঞ্জেকশান দেওয়া দরকার।

টিটেনাস টক্সয়েডের বুস্টার ডোজ (আগে দেওয়া না থাকলে) এই সময় দেওয়া হয়।

ড) বাচ্চা হওয়ার পর দুই থেকে চারদিন পর্যন্ত তলপেটে মাঝে মাঝে কামড়ে ধরার মত ব্যথা হয়। দুটি কারণে এরকম হয়। প্রথমত, জরায়ুর মধ্যে রক্তের ডেলা জমে থাকলে তা বের করে দেয়ার জন্য জরায়ুতে সংকোচন হয়। প্রথম বাচ্চার মায়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটাই কারণ। দ্বিতীয়ত, একাধিকবার সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এমন মায়েদের বাচ্চা হওয়ার পর জরায়ুর অতি সংকোচনের ফলে জরায়ুতে রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার জন্যে ব্যথা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বাচ্চাকে বুকে দুধ খাওয়ানোর সময় ব্যথা সামান্য বাড়তে পারে। তলপেটে আলতো করে চাপ দিয়ে জরায়ুতে ম্যাসাজ করলে অনেক সময় জমে থাকা রক্তের ঢেলা বেরিয়ে যায়। প্রয়োজনে চিকিৎসকেরা জরায়ুর ঠিকমতো সংকোচনের জন্য বা ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ দিয়ে থাকেন।

ঢ) জননদ্বার বা তার চারপাশে বাচ্চা বেরনোর সময় অত্যধিক চাপ পড়ায় যে আঘাত লাগে, তার জন্যে কয়েকদিন ব্যথা থাকতে পারে। **যদি ব্যথা খুব বেশী হয় বা ক্রমশ বাড়তে থাকে, তবে সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।** কারণ কোথাও রক্তনালী ছিঁড়ে মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত জমতে থাকলে তা থেকে বিশেষ বিপদ হতে পারে।

ণ) আমাদের দেশে সব মহিলারাই কম বেশী রক্তাল্পতায় ভোগে। বাচ্চা জন্মানোর পর তা হঠাৎই বেড়ে যেতে পারে। রক্তাল্পতা থাকলে চিকিৎসকের নির্দেশে বাচ্চা হওয়ার পর চার-ছয় সপ্তাহ প্রতিদিন একটি করে দুশো মিলিগ্রাম ফেরাস সালফেট বড়ি খাওয়া দরকার।

ত) রক্তচাপ বেশী থাকলে বা প্রস্রাবে প্রোটিন বেরোতে থাকলে তার যথাযথ চিকিৎসা প্রয়োজন।

এতাবৎ সাধারণ নির্দেশগুলি ছাড়াও মায়েদের দুটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার। শরীরকে তার পূর্বের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্যে তথা মায়ের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতেই এর প্রয়োজন। প্রথমত, কিছু ব্যায়াম করা এবং দ্বিতীয়ত, পরবর্তী সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা অন্তত বছর তিন-চার ঠেকিয়ে রাখতে প্রয়োজনীয় গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রসবোত্তর ব্যায়াম ঃ

গর্ভকালীন অবস্থায় এবং প্রসবের সময় পেট, তলপেট, শ্রোণীদেশ এবং জনন ও মলদ্বারের মাংসপেশীতে অত্যন্ত চাপ পড়ে। ফলে এই সমস্ত পেশী এবং কোমরের হাড়ের জোড় কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। ঠিকমতো যত্ন না

নিলে এ থেকে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন তলপেট-কোমর-পিঠে ব্যথা, জরায়ু যোনিপথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসা, ঘন ঘন প্রস্রাব ইত্যাদি। এ ছাড়াও কোমর বা পায়ের শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে অন্যতর অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য কয়েকটি হাল্কা ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত বাচ্চা হওয়ার পর অন্তত তিন মাস।

ক) সোজা হয়ে শুয়ে বুক ভর্তি করে শ্বাস নেয়া এবং ধীরে ধীরে পা নাড়ানো।

খ) সোজা হয়ে শুয়ে মলদ্বারের মুখ বন্ধ করার মতন চাপ দিতে হবে (খুব জোরে পায়খানা পেলে তা চেপে রাখার জন্য যেমন করা হয়)। সারাদিনে যতবার সম্ভব এটা অভ্যাস করা যায়। এতে শ্রোণীদেশের তথা জননদ্বার ও মলদ্বারের চারপাশের মাংসপেশী দৃঢ় হয়।

গ) হাঁটু থেকে পা দুটো ভাঁজ করে শুতে হবে। পায়ের পাতা দুটো বিছানায় থাকবে। এবার শ্বাস নেওয়ার সাথে সাথে পেটের পেশীগুলো প্রথমে শক্ত ও পরে ঢিলা করে দিতে হবে। অন্যথায় একই রকমে শুয়ে দুই হাঁটুর মাঝে একটা বালিশ নিতে হবে। তারপর দুই হাঁটু দিয়ে বালিশটাকে জোরে চাপতে হবে ও ছাড়তে হবে। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে পেটের মাংসপেশী দৃঢ় হয়।

ঘ) উপুড় হয়ে শুয়ে দুই হাত পাশে রাখতে হবে। এবারে ধীরে ধীরে মাথা এবং কাঁধ বিছানা থেকে তুলতে হবে ও নামাতে হবে। তবে কখনই বেশী জোর দেওয়া ঠিক নয়। প্রথমে দিনে তিন-চার বার শুরু করে আস্তে আস্তে এই সংখ্যা বাড়ানো যায়। অন্যথায় একই ভাবে উপুড় হয়ে পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে রাখতে হবে। এবার পেট এবং কোমর ধীরে ধীরে বিছানা থেকে তুলতে হবে ও নামাতে হবে। এই ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাস করলে পিঠ এবং মেরুদণ্ড সবল হয়, পেট-পিঠ-কোমরের ব্যথা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এছাড়া প্রয়োজনে কোন অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

গর্ভনিরোধক পরামর্শ ঃ

ক) যদি সদ্য-প্রসূতির আগের দুই বা ততোধিক বাচ্চা মোটামুটি সুস্থ অবস্থায় থাকে, তার অবশ্যই বাচ্চা বন্ধ করার অপারেশন করিয়ে নেওয়া উচিত। তবে শারীরিক কোন বিশেষ অসুবিধা থাকলে তার স্বামীর অপারেশন করানো দরকার।

খ) যদি প্রসূতি প্রথম বাচ্চার জন্ম দেয়, তবে তাকে প্রথম থেকেই 'দুটি বাচ্চার সংসার' এই ধারণার জন্যে উপদেশ দিতে হবে। দ্বিতীয় বাচ্চাটি যেন অন্তত আরো চার বছর পরে হয়, তার জন্যেও মহিলাটির মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। বাচ্চা হওয়ার পরের ছয় সপ্তাহ স্বামী সহবাস বন্ধ রাখার কথা আগেই বলা হয়েছে। এর পর তার জরায়ুতে 'কপার-টি' লাগিয়ে নেওয়া উচিত। (দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রচারে ঘাটতি থাকায় কপার-টি সম্পর্কে সাধারণ মহিলাদের যথেষ্ট ভীতি ও ভুল ধারণা রয়ে গেছে)। কপার-টি দুই তিন বছর ব্যবহারের পর খুলে ফেললে আবার বাচ্চা জন্মায়। আরো বেশীদিন সন্তানের জন্ম ঠেকাতে হলে দুই-তিন বছর পর পর কপার-টি পালটিয়ে নিতে হয়।

গ) কপার-টি যদি নেহাৎই অপছন্দের হয় অথবা এতে কোনরকম অসুবিধা হয়, তবে স্বামীকে 'নিরোধ' বা অন্য কোন 'কন্ডোম' ব্যবহার করতে হবে। বাচ্চা বুকের দুধ খাওয়া বন্ধ করলে অর্থাৎ বাচ্চা জন্মের আট-দশ মাস পর (বাচ্চা দুধ খেলে সেই সময় আবার অন্তঃসত্বা হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা কম) স্বামীর কন্ডোমের পরিবর্তে মেয়েদের গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়া শুরু করতে হয়। এর আগে বড়ি খেলে বুকের দুধ কমে যেতে পারে। মনে রাখবেন, **গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়া শুরু করার আগে অবশ্যই একবার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। বড়ি খাওয়ার নিয়ম ইত্যাদিও ভালো করে বুঝে নেবেন,** নতুবা এ থেকে বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

ঘ) দ্বিতীয় বাচ্চা জন্মের পর অর্থাৎ আরো প্রায় চার-পাঁচ বছর বাদে স্বামী অথবা স্ত্রীর বাচ্চা বন্ধের অপারেশন করিয়ে নিতে হবে।

বাচ্চা হওয়ার ছয় সপ্তাহ পর অতি অবশ্যই অন্তত একবার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে মায়ের যাওয়া উচিত। চিকিৎসকের দায়িত্ব প্রধানত তিনটি—

* **মায়ের সাধারণ স্বাস্থ্য তথা জননাঙ্গের পরীক্ষা করা।**
* **বাচ্চার স্বাস্থ্য তথা তার বৃদ্ধির বিকাশ বিষয়ে পরীক্ষা করা।**
* **মায়ের কোন অসুবিধা থাকলে তার জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও নির্দেশ দেওয়া।**

মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ

সাধারণভাবে মায়ের খিদে, ঘুম, প্রস্রাব-পায়খানা, রক্ত বা অন্য কোন স্রাব, পিঠের ব্যথা ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে। বাচ্চার খাবার ব্যাপারে অথবা বুকের দুধ ইত্যাদি বিষয়েও যথাযথ প্রশ্ন করা দরকার।

মায়ের ওজন, রক্তচাপ / রক্তাল্পতা আছে কিনা, পেটের মাংসপেশীর দৃঢ়তা এবং স্তন ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

নিয়ম করে মায়ের জননাঙ্গ পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে হবে–

ক) যোনিপথের ক্ষত সম্পূর্ণ শুকিয়েছে কিনা।
খ) যোনিপথে জরায়ু বেরিয়ে আসে কিনা।
গ) প্রস্রাব পেলে তা ধরে রাখা যায় কিনা।
ঘ) কোনরকম স্রাব আছে কিনা। থাকলে তা কি ধরনের ?
চ) শ্রোণীদেশের মাংসপেশীর দৃঢ়তা কেমন ?
ছ) জরায়ুর মুখে কোন ক্ষত আছে কিনা।

এছাড়া প্রয়োজনে রক্ত/প্রস্রাব এবং জরায়ুর মুখ থেকে সংগৃহীত লালা ইত্যাদির পরীক্ষা করা হয়।

মায়ের কোন গুরুতর রোগ যথা যক্ষা, উচ্চ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ, রক্তাল্পতা, মূত্রনালীর সংক্রমণ ইত্যাদি থাকলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে বেশীর ভাগ মেয়েদের ক্ষেত্রেই কিছু উপসর্গ দেখা যায়, সামান্য চেষ্টাতেই যাদের প্রতিবিধান করা যায় –

ক) যোনি পথে অনিয়মিত রক্তস্রাব ঃ প্রথমেই মায়েদের বোঝানো উচিত যে বাচ্চা হওয়ার পর, বিশেষ করে বাচ্চা বুকের দুধ খেলে, প্রথম মাসিক শুরু হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। অনেকের ক্ষেত্রেই তা যথেষ্ট দেরীতে শুরু হয়। তাছাড়া প্রথম দু-এক মাস মাসিক অনিয়মিত হতে পারে। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং রক্তাল্পতা দূর হলে তা ক্রমশ ঠিক হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম মাসিকের সময় প্রচুর রক্তপাত হয়। এর কোনটাই বিশেষ দুশ্চিন্তার নয়। তবে বাচ্চা জন্মানোর পর থেকে যদি ক্রমাগত রক্তস্রাব হয়, তবে তা জরায়ুতে গর্ভফুলের অংশবিশেষ থেকে যাওয়ার জন্য হয়। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের কাজ তা বের করে দেওয়া।

খ) সাদা স্রাব ঃ বাচ্চা হওয়ার পর কিছুদিন এ ধরনের স্রাব স্বাভাবিক। তবে সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি, রক্তাল্পতা, যোনিপথে জীবাণু সংক্রমণ অথবা জরায়ুর সম্পূর্ণ সংকোচন না হলে এই স্রাব দীর্ঘদিন ধরে খুব বেশী পরিমাণে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি, রক্তাল্পতা দূর করা ও কোন ধরনের জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণ হয়েছে তা জেনে নির্দিষ্ট চিকিৎসা করা দরকার। বাচ্চা হওয়ার পর অনেক মহিলার জরায়ুর মুখে ক্ষত থাকে। এর জন্য কোন বিশেষ উপসর্গ না থাকলে চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সাধারণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশেষ করে যোনিপথের পরিচ্ছন্নতা, বজায় রাখলে মোটামুটি তিন মাসের মধ্যে এটা নিজে থেকেই সেরে যায়। সেইজন্য এই সব মায়েদের আরো ছয় সপ্তাহ বাদে পরীক্ষা করা দরকার। যদি তখনও এই ক্ষত থাকে, তবে ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে তা পুড়িয়ে দিলে নিরাময় হয়।

গ) পিঠে ব্যথা ঃ অপুষ্টি এবং অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত বহু সন্তানের জন্মদাত্রী মহিলাদের একটি সাধারণ কষ্ট—সারাক্ষণ পিঠ-কোমরের ব্যথা। এর প্রধান কারণ কোমরের হাড়ের দুটি জোড়ার ওপর অত্যধিক চাপ। এছাড়া যোনিপথে জরায়ু বেরিয়ে আসা, জরায়ু মুখে ঘা, শ্রোণীদেশে প্রদাহ বা জরায়ুর অস্বাভাবিক অবস্থান ইত্যাদি কারণে পিঠে ব্যথা হয়। নিয়মিত পুষ্টিকর আহার, উপযুক্ত বিশ্রাম এবং ব্যায়াম অনেক ক্ষেত্রেই উপকার দেয়। অন্যথায় চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন।

ঘ) জরায়ুর অস্বাভাবিক অবস্থান ঃ সাধারণ অবস্থায় জরায়ুর ওপরের অংশ তলপেটের দিকে অর্থাৎ দেহের সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পর অনেক সময় তা পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর জন্য সাধারণত কোন ক্ষতি হয় না। তবে কখনো কখনো এর ফলে পিঠে ব্যথা, যোনিপথে জরায়ু সামান্য বেরিয়ে আসা বা জরায়ুর অসম্পূর্ণ সংকোচন হতে পারে। সেক্ষেত্রে কখনো কখনো যোনিপথে একটা রবারের গোল চাকা পরিয়ে দেওয়া হয়। মাস দুয়েক বাদে এটা বের করে নেওয়া হয়।

(ঙ) যোনিপথে জরায়ু বেরিয়ে আসা ঃ বাচ্চা হওয়ার পর জননদ্বার ও তার চারপাশের মাংসপেশীর শিথিলতার জন্য অনেক সময় যোনিপথে মূত্রথলি, মলাশয় বা জরায়ু বেরিয়ে আসতে পারে, বিশেষ করে প্রস্রাব পায়খানা করার সময় অথবা কোন ভারী কাজ করার সময়। এর প্রতিরোধে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পালন করা দরকার—

- প্রস্রাব/পায়খানা করার সময় ছাড়া কখনই উবু হয়ে বসতে নেই। বসার সময় পুরো চেপে বসা অথবা পিঁড়ি পেতে বসতে হবে।
- যতটা সম্ভব ভারী জিনিষ না তোলা।
- পায়খানা কষা হলে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। যথা প্রচুর জল এবং শাক-সবজি খাওয়া/ইসবগুলের ভূষি জাতীয় হাল্কা জোলাপ ব্যবহার করা।
- খুব বেশী হাঁচি বা কাশি হলে পেটে চাপ পড়ে। এতে জরায়ু আরো বেরিয়ে আসে। সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। (কাশির কার্যকারণ ও তার উপশমের উপায় জানতে আমাদের অষ্টম পুস্তিকা 'কাশি' পড়ুন—সম্পাদক)
- পূর্বে বর্ণিত ব্যায়ামগুলি নিয়মিত করা। এসব সত্ত্বেও উপকার না পেলে অপারেশন করা দরকার। এই অপারেশন বাচ্চা হওয়ার অন্তত ছয় মাস পরে করতে হয়।

বাচ্চার স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

সাধারণভাবে বাচ্চার ওজন ও দৈর্ঘ্য কতটা বেড়েছে, তার খাওয়া, ঘুম, পায়খানা কেমন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হয়। কোন রকম অসুস্থতা থাকলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বাচ্চাকে ঠিকমত টিকা ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপার মাকে বুঝিয়ে দিতে হয়।

উপসংহার :

শুরুতে যার কথা বলেছিলাম, সেই হাসিনা বেগমকে আমি ভুলেই গেছিলাম। এরকম কত হাসিনা, সাকিনা, কমলা, বিমলা রোজ হাসপাতালে আসে যায়, বাঁচে মরে। অতো কি খেয়াল থাকে। আজ আউটডোরে হাসিনা এসেছিলো। আমার নিজের লেখা ডিস্‌চার্জ সার্টিফিকেট্‌ দেখে খেয়াল হলো। সংক্ষেপে বলি—ওর কোলের বাচ্চাটা ভেদবমি হয়ে মারা গেছে। তা প্রায় মাস চারেক হলো। মা ষষ্ঠীর কৃপায় হাসিনা আবার সৌভাগ্যবতী, দুমাস চলছে। দুটো সংখ্যা আমার মাথায় এলো। এক, ভারতবর্ষে প্রতিদিন গড়ে শিশুমৃত্যু বারো হাজারের কিছু বেশী। হাসিনার ছোট বাচ্চাটা সেই সংখ্যার একটি। দুই, সারা তৃতীয় বিশ্বে বছরে মোট সাড়ে চার লক্ষ মহিলা সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। আমাদের দেশে এ সংখ্যা বছরে সত্তর হাজার।

এবারে নিতান্ত সম্ভব না হলেও পরের গর্ভে হাসিনাও হয়ত সেই মিছিলে সামিল হবার গৌরব অর্জন করবে! হাসিনার স্বামী শেখ সিরাজুল ক্ষেতমজুর, পরের জমিতে চাষ করে। কাজে সে খুব দড়। ঠিক বোঝে একটা ফসল তোলার পর আবার ফসল আবাদ করতে কতটা জল, নিড়েন, সার দরকার। জীবন্ত হাসিনার কাঠ-শরীর থেকে মাশুল আদায় করতে করতে খেয়াল থাকে না, এক ফসল থেকে অন্য ফসল ফলানোর মাঝে মেয়েটার শরীরের কিছু পুষ্টি, বিশ্রাম, আলো, হাওয়া দরকার ছিলো। চারা গাছের নীচের দিকের ডাল কেটে দিলে গাছ বাড়ে, বেশী পুষ্ট হয়, এটা জানা থাকলেও অশক্ত, দুর্বল, প্রাণশক্তি-হীন হাসিনার গর্ভাধানের সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসে না। শেখ সিরাজুল পরাণ মণ্ডলেরা বোঝে না, আর আমরা তাদের বোঝাই না। দোষটা বেশী কার—সে তর্ক থাক। তবে অসমনীতি আর রাজনীতির আলোকিত রাজপথে যাদের যাতায়াত, দায়টা যে মূলত তাদের, সেটা বেশ বোঝা যায়। দেশটাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই হাসিনা আর তার বাচ্চাটাকে বাঁচানো উচিত—এ কথাটা আগে তাদের উপলব্ধিতে আসা দরকার।

এই আলোচনা হাসিনা বা শেখ সিরাজুলের কাছে কতটা পৌঁছবে জানি না। তবে অন্তত সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত সচেতন মানুষজনের কাছে যাবে, তাদের কেউ কেউ একটু নড়ে বসবেন, এমন দুরাশা করছি।

পরিশিষ্ট ঃ

ক) বাচ্চা সবসময় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হওয়া উচিত, বিশেষত প্রথম সন্তান প্রসবের সময়। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তবে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত দাই-এর সাহায্য নিন। সামান্যতম অসুবিধা দেখা দিলে অবিলম্বে রোগিনীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। বাচ্চা জন্মানোর পর নীচের কোন এক বা একাধিক উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

- যোনিপথে অত্যধিক রক্তক্ষরণ।
- যোনিপথে দুর্গন্ধ-যুক্ত স্রাব বা পুঁজ পড়া।
- বাচ্চা হওয়ার সময় সৃষ্ট ক্ষত পেকে যাওয়া।
- হঠাৎ খিঁচুনি হওয়া।
- মূত্রনালিতে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে প্রস্রাবে জ্বালা, পুঁজ-রক্ত পড়া।
- প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কমে যাওয়া বা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া।

- বুকে দুধ জমে থেকে পেকে ঘা হয়ে যাওয়া।
- হঠাৎ বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট।
- মানসিক বৈকল্য।

খ) নবজাতকের জন্য মায়ের বুকের দুধ একান্ত জরুরী। শুধু তাই নয়। মায়ের ওপর শিশুর এটা জন্মগত অধিকার। সুতরাং বাচ্চা মারা গেলে অথবা নিতান্তই কোন রোগব্যাধিজনিত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কখনই মায়ের বুকের দুধ বন্ধ করা উচিত নয়।

একবার বুকে দুধ আসার পর শিশু দুধ টানতে থাকলে সেটা এক ধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। ফলে বুকে ক্রমাগত দুধ জমতে থাকে। সুতরাং বুকে দুধ আনা বন্ধ করতে হলে প্রথমেই বাচ্চাকে বুকে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। বুক টিপে অথবা পাম্প করে দুধ বন্ধ বের করে দেওয়া যাবে না। দু-তিনদিন শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ অথবা আঁটো ব্রেসিয়ার ব্যবহার করতে হবে। এর জন্য বুকে ব্যথা হলে, ব্যথার ওষুধ খাওয়া যায়। এতেও দুধ বন্ধ না হলে চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন হর্মোন জাতীয় ওষুধ খেতে হয়।

গ) অবাঞ্ছিত সন্তানের হাত থেকে রেহাই পেতে গর্ভপাত বা ভ্রূণ হত্যা এখন আইনসম্মত। আর এই আইনের সুযোগ নিয়ে মাত্র পাঁচ মিনিটেই যে কোন মাসিক খুলে দেওয়ার মিথ্যে সাইনবোর্ড চড়িয়ে অলিতে গলিতে হাজারো ক্লিনিক দিন দিন রমরমা ব্যবসা করে চলেছে। এর শতকরা নব্বই ভাগই চালায় একধরনের অপটু অশিক্ষিত হাতুড়ে, এবং এসব ক্লিনিকের অধিকাংশই রেজিষ্ট্রীকৃত নয়। প্রতিদিন অসংখ্য মহিলার গর্ভপাত করানোর সঙ্গে সঙ্গে অহেতুক জীবনপাতও এরা করে চলেছে। এদের ফাঁদে কদাচও পা দেবেন না।

সাধারণ বুদ্ধিতে Prevention is better than cure এই নিয়ম মেনে চলুন। বাচ্চা না চাইলে আগে থেকেই সতর্ক থাকুন। যদি আপনার অসাবধানতায় বাচ্চা পেটে আসে, তবে আর একবার ভাবুন নষ্ট না করে আপনার আনন্দের ফলটিকে বাঁচানো যায় কি না। নেহাৎই সম্ভব না হলে অবশ্যই সরকারী হাসপাতালে অথবা সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠিত ক্লিনিকে অভিজ্ঞ ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কাছে যান। □

তিনটি বিশেষ অনুরোধ ঃ

এক) **প্রথম বাচ্চা নষ্ট করবেন না।** এতে ভবিষ্যতে একেবারেই বাচ্চা না হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

দুই) **বাচ্চা নষ্ট করার জন্য বেশী মাত্রায় হর্মোন** জাতীয় **ওষুধ** বাজারে বিক্রি হয়। অত্যন্ত দুঃখের কথা, অনেক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকও এ ধরনের ওষুধ লিখে থাকেন। প্রসূতির ক্ষতি করা ছাড়া এই ওষুধের অন্য কোন কাজ নেই। তাই **এসব ওষুধ খাবেন না।**

তিন) বার বার বাচ্চা নষ্ট করলে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কারো কারো মতে, এর ফলে জরায়ুর মুখে ক্যানসারও অসম্ভব নয়। সুতরাং **একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কখনোই গর্ভপাত করাবেন না।**

---

* বার্ষিক 15 টাকা চাঁদায় গ্রাহক ও সহযোগী সদস্য হোন।
* পুস্তিকাগুলি মুদ্রণ ও প্রচার-প্রসারে সহায়তা করুন।
* আপনার সংগঠনের মুখপত্রের মাধ্যমে সহযোগীদের পুস্তিকাগুলি পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।
* জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা সভা/প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন।
* কলিকাতা ও অন্যত্র প্রগতিশীল বইয়ের দোকানে ও স্টলে আমাদের পুস্তিকা পাবেন। প্রয়োজনে 'জনস্বাস্থ্য প্রকাশন, 157সি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-700006, ফোন ঃ 54-4659' এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লেখক পরিচিতি : ডাঃ ধীমান মৈত্র গ্রামাঞ্চলে কর্মরত এক তরুণ সমাজসচেতন চিকিৎসক এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।

সংগঠন সম্পর্কিত যোগাযোগ :

কর্মসচিব, নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন,
ইউনিভারসিটি কলেজ অফ মেডিসিন,
244-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-700 020
(ফোন : 28-9646)

'জনস্বাস্থ্য প্রকাশন'-এর পক্ষে ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল জব প্রেস 1/5/1এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700012 হইতে মুদ্রিত।